সূচিপত্র

বইটি যাদের জন্য নয়	১৩
আমরা যা শিখতে যাচ্ছি	১৬
সবার আগে দরকার দক্ষতা	১৮
নিজেকে তৈরি করুন	২২
স্বভাব বদলে ফেলুন	২৬
হতে হবে সবার সেরা	২৯
কে আপনার বেশি প্রিয়?	৩৩
দক্ষতা কাজে লাগান	৪১
গরিব-দুঃখীদের ভালোবাসুন	৪৬
নারীদের সম্মান করুন	৪৯
শিশুদের মনোবৃত্তি বুঝুন	৫৭
অধীনস্থদের প্রতি সদয় হোন	৬৪
প্রতিপক্ষের সাথে সদাচার করুন	৬৮
জীবজন্তুর প্রতি দয়াশীল হোন	৭৯
মানুষের হৃদয় জয় করুন	৮৩
নিয়ত ঠিক করুন	৮৮

ব্যক্তি বুঝে আচরণ করুন ৯৫
পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন ১১২
প্রথম সাক্ষাতেই নিজেকে প্রমাণ করুন ১২১
সম্পর্কের আগে স্বভাব জেনে নিন ১২৮
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন ১৪৩
মন জয়ের চাবি ১৪৮
ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রাখুন ১৫১
অন্যকে গুরুত্ব দিন ১৫৮
মানুষকে বুঝতে দিন, আপনি তাদের কল্যাণকামী ১৭৩
নাম মনে রাখুন ১৭৮
প্রশংসা করুন ১৮১
কেবল সুন্দরের প্রশংসা করুন ১৮৮
সব বিষয়ে নাক গলাবেন না ১৯১
অযাচিত আচরণে করণীয় ১৯৬
সমালোচনা করবেন না ১৯৯
মেজাজ দেখাবেন না ২০৬
ভারসাম্য রক্ষা করে চলুন ২১৩
ভুলের সমাধান করুন সহজভাবে ২২২
উলটো প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন ২২৯
উত্তেজিত না হয়ে উত্তম ব্যবহার করুন ২৩৫
আগে সমস্যাটা জানুন, তারপর উপদেশ দিন ২৪৩
মানিয়ে নিতে শিখুন ২৫০
উপদেশ দেওয়ার আগে ভুলটা যাচাই করুন ২৬৩
শাসন করুন রয়েসয়ে ২৬৮
উটকো ঝামেলা এড়িয়ে চলুন ২৭২
ভুল হলে স্বীকার করুন ২৭৯

ভুল শোধরানোর সঠিক পদ্ধতি	২৮৫
কাজ করুন কৌশলে	২৯৩
ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলুন	৩০০
যার কোনো সমাধান নেই	৩০৬
দুশ্চিন্তা কোনো সমাধান নয়	৩০৮
আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট থাকুন	৩১২
হয়ে উঠুন পাহাড় যেমন	৩১৮
পাপকে ঘৃণা করুন, পাপীকে নয়	৩২৪
ভাগ্য উপভোগ করুন	৩২৭
মতভেদকে বিভেদের কারণ বানাবেন না!	৩৩০
কোমলতা মানুষের সৌন্দর্য বাড়ায়	৩৩৪
জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন না	৩৪৫
মিষ্টি ভাষায় কথা বলুন	৩৫৮
উপদেশ দিন সংক্ষেপে	৩৬৬
অন্যের কথায় কান দেবেন না	৩৭১
প্রাণ খুলে হাসুন	৩৭৪
পরিমিতিবোধ বজায় রাখুন	৩৭৮
গোপন কথা গোপনই রাখুন	৩৮৩
মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসুন	৩৯০
যা পারবেন না, তা করতে যাবেন না	৩৯৫
বিড়ালটিকে লাথি মারল কে?	৪০১
মানুষের প্রতি বিনয়ী হোন	৪০৯
গোপন ইবাদত	৪১২
মানুষকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচান	৪২০
বাহ্যিক বেশভূষায় যত্নবান হোন	৪২৩
সদা সত্য বলুন	৪২৭

কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলুন	৪৩১
নীতিতে অটল থাকুন	৪৩৪
প্রলোভনে গলে যাবেন না	৪৩৮
ক্ষমা করতে শিখুন	৪৪৩
উদারতায় হোন অনন্য	৪৫৩
কারও কষ্টের কারণ হবেন না	৪৬০
কাউকে শত্রু বানাবেন না	৪৬৪
জিহ্বা যখন নিয়ন্ত্রক	৪৬৬
জিহ্বা সংযত রাখুন	৪৭৩
হৃদয়ের জানালা	৪৭৭
হৃদয়ে খুলুন ভালোবাসার সঞ্চয়ী হিসাব	৪৮৫
কথায় জাদুময়তা আনুন	৪৮৯
কাজে না পারলে কথায় অন্তত খুশি করুন	৪৯৮
অন্যের জন্য দুআ করুন	৫০৭
ভুল হলে শুধরে নিন	৫২১
একচোখা নীতি পরিহার করুন	৫২৫
মন দিয়ে শুনুন	৫২৯
বিতর্কে দক্ষ হোন	৫৩৪
শুরুতেই আপত্তির দরজা বন্ধ করে নিন	৫৪০
আপত্তি তোলার আগে আরেকবার ভাবুন	৫৪৪
আবেদনের শুরুতে ভূমিকা যোগ করুন	৫৪৮
সবসময় সফল হওয়া জরুরি নয়	৫৫৭

বইটি যাদের জন্য নয়

একবার আমার মোবাইলে ছোট্ট একটি মেসেজ আসে, 'শাইখ, আত্মহত্যার বিধান কী?'

আমি মেসেজের কোনো উত্তর না দিয়ে সরাসরি ওই নম্বরে ফোন করি। ওপাশ থেকে উঠতি বয়সি এক তরুণ কল রিসিভ করে। তাকে বিনয়ের সাথে বলি, 'দুঃখিত, তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পরিনি! দয়া করে বুঝিয়ে বলবে কি?'

সে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়, 'প্রশ্ন তো স্পষ্টই। আমি জানতে চাইছি আত্মহত্যার বিধান কী?'

আমি তাকে অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমকে দিতে চাই, 'আত্মহত্যা করা মুস্তাহাব।'

উত্তেজনায় সে চিৎকার করে ওঠে, 'কী, কী বললেন!'

সামলে ওঠার আগেই তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এবার বলো, আত্মহত্যার সহজ একটি পথ বলে দিয়ে আমি কি তোমাকে সাহায্য করব?'

আমার উৎসাহ দেখে সে দমে যায়। তাকে অভয় দিয়ে বলি, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তুমি চাইলে আমাকে বলতে পারো, ঠিক কী কারণে এমনটা করতে চাইছ?'

সে জানায়, 'আমি বেকার। বহু চেষ্টা করেও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারিনি। কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। আমি চরম ব্যর্থ...'

এরপর সে তার ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার লম্বা এক গল্প শোনায় আমাকে। আমার মনে হয়, সে নিজেকে যতটা অক্ষম আর অসফল বলে চিত্রায়িত করছিল, বাস্তবে ঠিক ততটা

নয়। আল্লাহ তাকে এটুকু যোগ্যতা দিয়েছিলেন, যা কাজে লাগিয়ে সে অনায়াসেই সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারত। কিন্তু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও হতাশাবোধ তাকে তার শক্তির উৎস খুঁজে পেতে দেয়নি। ফলে সে আর নিজেকে চিনে উঠতে পারেনি।

আজকালকার যুবকদের এটা একটা সাধারণ সমস্যা। কেউই নিজের ভেতরে একটু উঁকি দিতে চায় না। জানার চেষ্টা করে না নিজের পরিচয়টা। জীবনের যে সময়টায় প্রচেষ্টার বলে নিজেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেসময়টায় সফল মানুষদের দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের ঠেলে দেয় হতাশার অতলে।

সফলদের দিকে তাকিয়ে আমাদের যুবকেরা কেন নিজেদের ছোট করে দেখে? কেন তাদের ভেতরে এ প্রত্যয় জাগে না—অন্যরা পারলে আমি কেন পারব না? অন্তত চেষ্টা তো করে দেখতে পারি? নিজের মতো করে শুরু করতে সমস্যা কোথায়? এদেরকে লক্ষ্য করেই হয়তো কবি বলেছেন—

পাহাড়-চূড়ায় আরোহণে যার ভয়
আমরণ সে ভূতলেই পড়ে রয়।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি জানেন, বইটি কাদের জন্য নয়?

তারা হলো সেসব দুর্ভাগা—যারা ভুলকে ভয় পায়, ব্যর্থ হতে পারে ভেবে কাজই শুরু করে না, ভাগ্যের কাছে অসহায় মনে করে নিজেকে। সেইসাথে জ্ঞানীর মতো বলে—'আমি জন্মেছিই এভাবে। মানুষ তো তা-ই বলে। আমার যা আছে, এতেই আমি খুশি। আমার দ্বারা নিজেকে বদলানো সম্ভব নয়। আমি খালিদের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। পারি না আহমাদের মতো সবসময় হাসিখুশি থাকতে। আর যিয়াদের মতো খ্যাতি অর্জন করা তো আমার পক্ষে অসম্ভব!'

মনে পড়ে, একবার আমি এক সেমিনারে অতিথি হয়েছিলাম। সেমিনারটি ছিল সাধারণ পর্যায়ের। আমন্ত্রিত লোকজনও ছিল সেরকম। আহামরি যোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না কাউকে। সেমিনার শুরু হওয়ার আগে খেয়াল করি, এক রসিক বৃদ্ধ চুটিয়ে গল্প করছেন তার পাশের লোকটির সাথে। তার যে বয়স, সে কারণে তিনি সবার সম্মানের পাত্র হওয়ার কথা। কিন্তু তার চপলতার কারণে সেরকম কিছু চোখে পড়ছিল না।

সেমিনার শুরু হলে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে আমি শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু বাযের একটি ফতোয়া উল্লেখ করি। আলোচনা শেষ হলে সেই বৃদ্ধ আমার কাছে এসে গর্ব করে বলেন, 'আপনি জেনে অবাক হবেন, ইবনু বায আমার সহপাঠী। আজ থেকে ৪০ বছর আগে আমরা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিমের কাছে

একসাথে পড়েছি।'

আমি লক্ষ করি, এ তথ্যটি জানাতে পেরে তিনি ভীষণ খুশি। তৃপ্তির উজ্জ্বল আবেশ ছড়িয়ে আছে তার সমস্ত চেহারায়। কোনো একসময় সফল এক ব্যক্তির সঙ্গ পেয়েছিলেন বলে বর্তে গেছেন যেন!

তার এ উচ্ছ্বাস দেখে বারবার আমার মনে হতে থাকে—প্রিয়, তাহলে তুমি কেন পারলে না ইবনু বাযের মতো সফল হতে? তুমিও তো একই পথের পথিক ছিলে। তারপরও কেন পৌঁছতে পারলে না গন্তব্যে? ইবনু বাযের মৃত্যুতে যেখানে মিহরাব কাঁদে, মিম্বার কাঁদে; কাঁদে জ্ঞানকেন্দ্র ও বিচারালয়—সেখানে তোমার মৃত্যুর পরে কে স্মরণ করবে তোমাকে? কে দুফোঁটা অশ্রু ফেলবে তোমার জন্য? কেউ না। সৌজন্য দেখানো কিংবা সমাজের সাধারণ নিয়মের অনুসরণ ছাড়া কেউই কাঁদবে না তোমার জন্য।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি—অমুকের সাথে আমার ভালো পরিচয়, সে তো আমার দীর্ঘদিনের সহপাঠী, তমুকের সাথে ওঠাবসা ছিল আমার—এসব বলে অবচেতনেই নিজেদের পরিচয়কে গৌরবান্বিত করতে চাই। কিন্তু এতে আসলে প্রকৃত গৌরব নেই। গৌরব মূলত নিজেকে তাদের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

তাই সাহস রাখুন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন। দক্ষতা কাজে লাগান। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলুন। হতাশাকে পরিণত করুন হাসিতে। দুশ্চিন্তাকে বিদায় দিন। সবসময় হাসিখুশি থাকুন। কৃপণতা ছেড়ে দিন। বাড়িয়ে দিন দানের হাত। রাগ-ক্রোধ হজম করুন। কাজ করুন ধৈর্যের সাথে। বিপদের মধ্যেও খুঁজে বের করুন আনন্দ। ঈমানকে গ্রহণ করুন এমন অস্ত্র হিসেবে, যা দিয়ে সবকিছুকে জয় করে নেবেন।

সহজ কথায়, জীবন উপভোগ করুন। পার্থিব জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। এখানে দুশ্চিন্তার অবকাশ নেই। কিন্তু দুশ্চিন্তার আবর্তে থেকে কীভাবে আপনি জীবনকে উপভোগ করবেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই এই গ্রন্থের গ্রন্থনা। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাকে পৌঁছে দেব গন্তব্যে!

সতীর্থ

এ পথচলায় কেবল তারাই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেন, যাদের প্রতিজ্ঞা করার মতো একটি মন আছে; সেইসাথে আছে দক্ষতা অর্জনে লেগে থাকার মতো মনোবল এবং তা কাজে লাগানোর সক্ষমতা।

সবার আগে দরকার দক্ষতা

একবার আমি বক্তৃতা করতে যাই এক দারিদ্র্যনিপীড়িত এলাকায়। স্থানীয় ও দূরদূরান্ত থেকে আগত অনেক জ্ঞানীগুণী লোক অংশ নেন সে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে এক স্কুলমাস্টার আমার সাথে দেখা করতে আসেন। বহুদূর থেকে এসেছেন তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে। ভদ্রলোক সংক্ষেপে পরিচয়পর্ব সেরে আমাকে বলেন, 'কজন শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহনে আপনি আমাদের সাহায্য করুন!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'স্কুল তো সরকারি, শিক্ষাও অবৈতনিক। এখানে শিক্ষাব্যয় বহনের সুযোগ কোথায়? এ প্রশ্নই-বা আসে কোত্থেকে?'

'আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকি।'

'কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তো সরকারি ও অবৈতনিক। তাছাড়া সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।'

'দয়া করে একটু সময় দিন। পুরো বিষয়টা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'আমাদের এখানে শিক্ষার হার যথেষ্ট ভালো। শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থীই কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক স্কুল থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করে। এদের সিংহভাগই প্রচণ্ড মেধাবী এবং অনন্য প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু তাদের কেউই মাধ্যমিক স্তর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে পারে না। বাইরের কোনো কলেজ-ভার্সিটিতে গিয়ে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক ল অথবা কম্পিউটার সাইন্সে উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলে তাদের বাবারা বাদ

সাধেন—যথেষ্ট লেখাপড়া করেছ বাবা! এবার আমার সাথে ছাগল চরাও।'

'কী, লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছাগল চরাবে?' নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠি।

'হ্যাঁ, ছাগল চরাবে। এটাই তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত। অসহায় শিক্ষার্থীদের এ সিদ্ধান্ত না মেনে উপায় নেই। তাই তারা ছাগল চরানোর কাজে লেগে যায়। এভাবে অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায় তাদের অমিত মেধা ও প্রতিভা। বছরের পর বছর আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা ছাগল চরাতে থাকে।'

'এর কোনো সমাধান ভেবে দেখেছেন?'

'আমরা একটা সমাধান খুঁজে বের করেছি। তা হচ্ছে, একজন রাখালের খরচ বাবদ প্রত্যেক বাবাকে কয়েক শ রিয়াল বার্ষিক ভাতা দিই। এতে তাদের সন্তানরা মেধা বিকাশের সুযোগ পায়। দেশ ও সমাজের সেবায় কাজে লাগে তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা। কলেজ-ভার্সিটিতে যাওয়ার পর গ্রাজুয়েশন শেষ করা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি। আমাদের তরুণদের মেধা ও প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে আর আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখব—তা তো হতে পারে না; হতে দেওয়া যায় না।'

শেষ কথাগুলো বলার সময় ভদ্রলোকের গলা ধরে আসে। আনমনা হয়ে মাথা নিচু করে রাখেন কিছুক্ষণ।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ আমি তার কথাগুলো নিয়ে ভাবি। তখন মনে হয়, এভাবে মেধার অপচয় হতে দেওয়া উচিত না। যাদের সহজাত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা আছে, তারা সেগুলো কাজে না লাগালে অথবা তাদের সুযোগ করে দিতে না পারলে, আমরা জাতি হিসেবে কখনোই উন্নত হতে পারব না।

আরেকটা বিষয়, সবকিছুতে সবার সহজাত দক্ষতা বা আকর্ষণ থাকতে হবে—তা কিন্তু জরুরি নয়। তবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে অথবা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হলে, অবশ্যই আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

দক্ষতা ছাড়াই সফলতা পেয়ে যাবেন—এমনটা ভাবা অবান্তর। জ্ঞানবিজ্ঞান বলুন কিংবা অন্য কোনো শাস্ত্র বা পেশা—সব জায়গায় কেবল তারাই সফল হয়, যারা তাদের কর্ম ও পেশায় রাখতে পারে দক্ষতার স্বাক্ষর। সংসারের ক্ষুদ্র গৃহকোণ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহৎ পরিসর—সবখানে এটাই সফলতার পূর্বশর্ত।

তবে এটা সত্য, আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সহজাত প্রতিভা ও দক্ষতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। সেসব কাজে লাগিয়ে তারা সফলতার শিখর স্পর্শ করে। অনেক সময় আলাদা করে অনুভবও করতে পারে না—ঠিক কী কী কর্মদক্ষতার কারণে তারা আজ

সফল। আবার কিছু মানুষ জন্মসূত্রে এ দক্ষতা পায় না। তাদের এটা অর্জন করতে হয় শিক্ষা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তারপর একে কাজে লাগিয়ে পৌঁছতে হয় সফলতার শিখরে।

এখানে আমরা কথা বলব দ্বিতীয় শ্রেণির সফলদের নিয়ে। তাদের জীবন পাঠ করব। জীবনের বাঁকবদলগুলো দেখব গভীর দৃষ্টিতে। এরপর দেখব, ঠিক কোন পথে তারা সফলতার সন্ধান পেয়েছেন এবং কীভাবে নিজেদের নিয়ে গেছেন উন্নতির শীর্ষ চূড়ায়? এতে তাদের পথে চলা এবং তাদের মতো নিজেদের সাফল্যমণ্ডিত করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

কিছুদিন আগে পৃথিবীর শীর্ষ ধনকুবের সুলাইমান রাজিহির একটি সাক্ষাৎকার শুনেছি। চিন্তা ও চরিত্রে তাকে মনে হয়েছে পাহাড়ের মতো বিশাল ও অবিচল। তিনি এখন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক। স্থাবর সম্পত্তিরও অভাব নেই তার। দানের হাতও প্রশস্ত। এ পর্যন্ত কয়েক শ মসজিদ নির্মাণ করেছেন তিনি। হাজার হাজার এতিম-অনাথের ভরণপোষণও করে যাচ্ছেন নিয়মিত। সবদিক থেকেই তিনি একজন সফল মানুষ।

সাক্ষাৎকারে তিনি তার সংগ্রামী জীবনের শুরুর অবস্থা নিয়ে অকপট কথা বলেন। ৫০ বছর আগে যখন ভাগ্যের সন্ধানে বের হন, তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত সাধারণ গোছের একজন মানুষ। দিন এনে দিন খেতেন। কোনো কোনো দিন সেটাও জুটত না কপালে। দুমুঠো খাবারের জন্য মজুর খাটতেন। মানুষের ঘরদোর পরিষ্কার করতেন। অনেক সময় দোকানের কর্মচারী অথবা অফিসের পিয়ন হিসেবে দিনরাত পরিশ্রম করতেন।

সেই ছন্নছাড়া অবস্থা থেকে কীভাবে তিনি সফলতার চূড়ায় পৌঁছলেন এবং এখনো ওপরে উঠেই চলেছেন, তার পুরোটা তুলে ধরেন সে সাক্ষাৎকারে।

আমি তার মেধা ও দক্ষতা এবং এ দুয়ের সমন্বয়ে পাওয়া সফলতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি। তখন মনে হয়, আমরাও চাইলে তার মতো সফল হতে পারি। তবে এজন্য আমাদের কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে; অধ্যবসায়ের সাথে করে যেতে হবে কঠোর পরিশ্রম।

এজন্য আমরা সবার আগে দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করব। কারণ আমাদের অনেকেই অসামান্য সৃষ্টিশীলতা নিয়ে জন্মে। কিন্তু সহজাত প্রতিভা সম্পর্কে সবার সমান বোধ থাকে না। কেউ সেটা অনুভব করতে পারে, কেউ পারে না। অনেকে আবার অনুকূল পরিবেশের অভাবে বিকাশ ঘটাতে পারে না তার প্রতিভার। তাদের প্রয়োজন হয় একজন প্রশিক্ষকের, দক্ষ পরিচালকের অথবা কারও আন্তরিক পরামর্শের—যার সান্নিধ্য ও পরিচর্যায় তারা আত্মপরিচয় লাভ করে, সন্ধান পায় আপন শক্তির।

কিন্তু সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না। এমন সচেতন অভিভাবক পায় না সবাই। ফলে

অবিকশিত থেকে যায় তাদের প্রতিভাগুলো। একসময় মানব স্বভাবের স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের এনে দাঁড় করায় নিতান্ত সাধারণ মানুষের কাতারে। এভাবে আমরা হারিয়ে ফেলি সম্ভাবনাময় বহু জনদরদি নেতা, সুচিন্তক বক্তা, বিদগ্ধ আলিম, সফল স্বামী ও হিতৈষী বাবাদের।

এই গ্রন্থে আমরা বিশেষ কিছু দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করব—যেগুলো আপনার মধ্যে থেকে থাকলে শানিত করব। আর না থাকলে সৃষ্টি করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

পাথেয়

যখন পাহাড়ে আরোহণ করবেন, তখন আপনার দৃষ্টি থাকবে চূড়ার দিকে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা নুড়িপাথরের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। সাবধানে পা ফেলে ওপরে উঠবেন। লাফানোর চেষ্টা করবেন না, পা ফসকে যেতে পারে।

নিজেকে তৈরি করুন

জীবনে এমন অভিজ্ঞতা থাকতেই পারে—কখনো কোথাও নির্দিষ্ট বয়সের এক যুবকের সঙ্গে আপনার ওঠাবসার সুযোগ হয়েছে। চলনবলনে আপনি তার মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছেন। তার মন-মানস ও চিন্তা-চরিত্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছেন কিছুটা। এরপর দীর্ঘদিন আপনাদের যোগাযোগ ছিল না। ১০ বছর পর যুবকটি যখন অনেকখানি বুড়িয়ে গেছে, তখন আবার তার সাথে দেখা। কুশল জিজ্ঞাসার ভেতরে আপনি আবিষ্কার করেন, এ ১০ বছরে কেবল বয়স ছাড়া আর কিছুতে তার উন্নতি হয়নি। ১০ বছর আগে চিন্তা-চরিত্রের যে স্তরে তাকে দেখেছিলেন, এখনো সেখানেই তার অবস্থান।

আবার হয়তো এমন মানুষও পেয়েছেন, যারা জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। অব্যাহত চেষ্টায় প্রতিদিন নতুন নতুন মাইলফলক স্পর্শ করছে তারা। একটু একটু করে নিজেরাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে নিজেদের। তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হচ্ছে পার্থিব কিংবা পারলৌকিক উন্নতি সাধনে।

মানুষের এ শ্রেণি-প্রভেদ বুঝতে চাইলে চলুন টিভি-দর্শকদের ওপর সংক্ষিপ্ত একটি জরিপ চালাই। দর্শকদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক আছে, যারা খুঁজে খুঁজে এমন চ্যানেল দেখে—যা তাদের চিন্তার গঠন ও মেধার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার ও মতবিনিময় শোনে। আলোচকদের থেকে ভাষাজ্ঞান, চিন্তার ক্ষিপ্রতা, উপস্থাপন শৈলী, যুক্তি প্রদর্শন, উপস্থিত উত্তর প্রদান এবং বিরোধী পক্ষ ও শ্রোতাদের কাছে নিজের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কৌশল রপ্ত করে।

আরেক শ্রেণির দর্শক কেবল বেছে বেছে এমন চ্যানেল দেখে—যেখানে রম্য নাটক, চটুল সিরিয়াল, হরর মুভি অথবা ভিত্তিহীন কল্পকাহিনি প্রচারিত হয়।

উভয় শ্রেণি টানা ৫ অথবা ১০ বছর টিভি দেখার পর যদি তাদের গুণগত মান বিচার করেন, তাহলে কী দেখবেন? কাদেরকে আপনার দক্ষ ও উন্নত মনে হবে? কাদের চিন্তাশৈলী ও কাণ্ডজ্ঞান আপনাকে মুগ্ধ করবে? আপনার বিচারে কারা এগিয়ে থাকবে দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং মানুষের সঙ্গে লেনদেন ঠিক করায়?

অবশ্যই প্রথম শ্রেণির দর্শক। ৫ বা ১০ বছরে আপনি দেখবেন, তাদের কথা বলার দক্ষতা-সহ সার্বিক যোগ্যতা বেড়েছে অনেকখানি। জীবনযুদ্ধে একবিন্দুতে থেমে নেই তারা। খেয়াল করলে দেখবেন, তারা তাদের কথাবার্তায় অনবরত কুরআন-হাদিস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র থেকে রেফারেন্স তুলে ধরছে। তাদের উপস্থাপন শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে সবাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির দর্শকদের দেখবেন, তাদের যোগ্যতা একই বিন্দুতে থেমে আছে। কথায় কথায় তারা কেবল তুলে ধরে নায়ক-গায়ক ও অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ। এর বাইরে তাদের কোনো রকমের পারঙ্গমতা নেই। এ শ্রেণির এক ভদ্রলোক একদিন তার বক্তব্যে বলছিল, 'আল্লাহ বলেছেন, হে আমার বান্দা, চেষ্টা করে যাও; আমিও চেষ্টা করছি তোমার সাথে।' সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে সতর্ক করে বলি, এটি কিন্তু আল্লাহর কথা অথবা কুরআনের আয়াত নয়। লোকটি তখন চুপ হয়ে যায়। মুহূর্তে পালটে যায় তার চেহারার রং।

পরে আমি তার উদ্ধৃতিটি নিয়ে চিন্তা করি। তখন ধরা পড়ে, এটি একটি মিশরীয় প্রবাদ। কোনো এক টিভি-সিরিয়ালে ভদ্রলোক শুনেছিল। সেই থেকে এটি সেঁটে আছে তার মস্তিষ্কে। আর বাস্তবতা এটাই—প্রতিটি পাত্র থেকে তা-ই বের হয়, যা তা ধারণ করে।

এবার আসুন, পত্রিকা ও সাময়িকী পাঠকদের ওপর একটু দৃষ্টিপাত করি। এখানেও দুই শ্রেণির পাঠক পাওয়া যাবে। এক শ্রেণির পাঠক এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, কলাম ও আর্টিকেল পড়ে—যেগুলো তাদের ব্যক্তিগত কাজে আসে, দক্ষতা সৃষ্টি করে এবং সাধারণ জ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ায়। অপরদিকে আরেক শ্রেণিকে দেখা যাবে, তাদের দৃষ্টি কেবল খেলা আর বিনোদন পাতায় নিবদ্ধ থাকে। এর বাইরে যেন কিছুই ছাপা হয় না পত্রিকায়। সংখ্যার বিচারে এ শ্রেণির পাঠকই বেশি। তাই পত্রিকাগুলোতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে—খেলা আর বিনোদনমূলক সংবাদ পরিবেশনে কে কার চেয়ে এগিয়ে থাকবে!

আমাদের ঘরের লোকজন, ঘরোয়া বৈঠক এবং অবসর সময় যাপনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান।

এজন্যই বলি, গাছের শাখা না হয়ে শেকড় হতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে দক্ষতার উপাদানগুলো। সুন্দর আগামীর জন্য

এভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে।

চলুন এবার, দক্ষতার অভাব থাকলে কী ঘটতে পারে—সেটা একটু দেখে নিই। আব্দুল্লাহ নামে এক লোক ছিল। সে ছিল খুবই আবেগপ্রবণ ও ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তার দক্ষতার অভাব ছিল যথেষ্ট। একদিন সে যুহরের সালাত আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হলো। জামাতের সময় হয়ে যাওয়ায় দ্রুত পথ চলছিল। পথিমধ্যে দেখল, এক গাছি খেজুর গাছে উঠে গাছ ঝুড়ছে। সালাতের প্রতি গাছির উদাসীনতা দেখে আব্দুল্লাহ একটু অবাকই হলো। তার মনে হলো, লোকটি যেন আজানই শোনেনি। ইকামতের প্রতিও কোনো ব্যাকুলতা নেই তার।

আব্দুল্লাহ তখন খেঁকিয়ে উঠল, 'নিচে নেমে আগে সালাত পড়ে নাও।'

গাছি শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও নামছি।'

আব্দুল্লাহ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'আরে গাধা, জলদি নেমে এসে সালাত পড়!'

এবার গাছিও চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললি, আমি গাধা! দাঁড়া আজকে...'

এ কথা বলেই সে খেজুরের একটি ডাল নিয়ে নিচে নামতে লাগল আব্দুল্লাহর মাথা ফাটাতে। আব্দুল্লাহ ভয়ে মুখ লুকিয়ে দ্রুত মসজিদে চলে গেল।

লোকটি ক্ষুব্ধ অবস্থায় গাছ থেকে নামল। বাড়িতে গিয়ে সালাত পড়ল। একটু জিরিয়ে এসে শুরু করল বাকি কাজ। এরই মধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেল। আব্দুল্লাহও যথারীতি মসজিদের উদ্দেশে রওনা হলো। পথিমধ্যে দেখল, গাছি আবারও গাছ কাটায় ব্যস্ত। এবার আব্দুল্লাহ ভিন্ন সুরে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।'

'এবার ফলন কেমন হয়েছে?'

'ভালো, আলহামদুলিল্লাহ।'

'আল্লাহ আপনাকে সফলকাম করুন। আপনার রিজিক বাড়িয়ে দিন। পরিবার-পরিজনের জন্য আপনার শ্রম যেন সার্থক হয়—সেই দুআ রইল।'

আব্দুল্লাহর দুআ শুনে লোকটির মন গলে গেল। হাসি খেলে গেল তার মুখে। সে 'আমিন' বলে আব্দুল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

আব্দুল্লাহ বলল, 'মনে হচ্ছে অতি ব্যস্ততার কারণে আসরের আজান খেয়াল করতে পারেননি। আজান হয়ে গেছে। জামাতের সময়ও হয়ে এসেছে। আপনি যদি এখন গাছ

থেকে নেমে সামান্য জিরিয়ে নেন আর জামাতের সাথে সালাত পড়ে বাকি কাজে হাত দেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন।'

লোকটি উত্তর দিল, 'এখনই নামছি।'

এ কথা বলে লোকটি নেমে এল। আব্দুল্লাহর সাথে মুসাফা করতে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, 'এমন ভদ্র আচরণের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে যে লোকটি যুহরের সময় এদিক দিয়ে গিয়েছে, তাকে পেলে দেখে নিতাম!'

শিক্ষা

মানুষের সাথে যে আচরণ করবেন, তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে, তাদের থেকে ঠিক কোন আচরণটি পেতে যাচ্ছেন।

স্বভাব বদলে ফেলুন

অজ্ঞাত কোনো কারণে অনেকে মনে করে, যে স্বভাব নিয়ে সে জন্মেছে তা আর বদলানো সম্ভব নয়। এটা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, নিয়তির নিঠুর নিয়ন্ত্রণ—অনেকটা গায়ের রং আর দেহকাঠামোর মতো। এজন্য ভাগ্যের মতো স্বভাবের কাছেও তারা আত্মসমর্পণ করে। নিজের যা আছে, তা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকে। অবস্থার উন্নতিকল্পে তেমন ভাবে না।

কিন্তু যারা জ্ঞানী, প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তন যাদের ভেতর আলোড়ন তোলে, তাদের কাছে স্বভাব পরিবর্তন পোশাক বদলের চেয়েও সহজ। কারণ তারা জানে, মানব স্বভাব মাটিতে ঢেলে পড়া দুধের মতো নয়—যা কেউ চাইলেও আর পাত্রে তুলে আনতে পারে না। স্বভাব তো আমাদের হাতের মুঠোয়। একটু চেষ্টা করলেই একে পরিবর্তন করে ইতিবাচক খাতে প্রবাহিত করতে পারি। শুধু তা-ই নয়, আমরা চাইলে মানুষের চিন্তার গতিপ্রকৃতি পর্যন্ত বদলে ফেলতে পারি নিজেদের ইচ্ছামতো।

ইবনু হাযম তার *তাওকুল হামাম* গ্রন্থে লিখেন—

‘স্পেনে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিল। কোনো এক কারণে চারজন ধূর্ত ব্যবসায়ীর সাথে তার বিবাদ দেখা দেয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয়—যেকোনো মূল্যে তাকে উচিত শিক্ষা দেবে। একদিন সকালে ওই ব্যবসায়ী দোকানের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়। তখন তার পরনে ছিল একটি সাদা জামা ও সাদা পাগড়ি। সে কিছুদূর যেতেই ওই চারজনের প্রথমজন এসে তাকে সালাম করে। এরপর তার পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘এই হলুদ পাগড়িতে আপনাকে দারুণ মানিয়েছে।’ ব্যবসায়ীটি তখন বলে, ‘তুমি কি অন্ধ? দেখছ না, এটি একটি সাদা পাগড়ি।’ লোকটি বলে, ‘না, এটি হলুদ পাগড়িই। তবে আপনাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে।’

এরপর ব্যবসায়ীটি আরও কিছুদূর এগোলে দ্বিতীয়জন এসে তাকে সালাম করে। তারপর কুশল জিজ্ঞাসার একপর্যায়ে তার পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরে বাহ! আজ তো আপনাকে দারুণ লাগছে। গায়ে সাদা পোশাক, মাথায় সবুজ পাগড়ি—দারুণ মানিয়েছে আপনাকে!' ব্যবসায়ী লোকটি কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলে, 'আরে ভাই, এটা সবুজ নয়, সাদা পাগড়ি।' লোকটি বলে, 'না, সবুজ।' ব্যবসায়ী বলে, 'না, সাদা। দূর হও তুমি আমার এখান থেকে।'

বেচারা ব্যবসায়ী বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চলে। চলতে চলতে বারবার কাঁধের ওপর পাগড়ির ঝুলে থাকা অংশের দিকে তাকায় আর বলে, 'কই, পাগড়ি তো সাদাই।' কিছুক্ষণ পর সে দোকানে পৌঁছে যায়। তালা খুলতে যাবে ঠিক এমন সময় তৃতীয়জন এসে হাজির। বলে, 'আজকের সকালটা দারুণ সুন্দর। আপনার পোশাক-আশাক যেন তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নীল পাগড়ির কারণে আপনার থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না।'

ব্যবসায়ীটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাগড়ির দিকে তাকায়। তার কাছে সাদাই মনে হয় পাগড়ির রং। কিছুক্ষণ চোখ কচলে আবার তাকায়। এরপর প্রচণ্ড বিরক্ত গলায় বলে, 'আরে ভাই, আমার পাগড়ি সাদা।' লোকটি বলে, 'আরে না। নীলই তো। তবে আপনার মন খারাপ করার কিছু নেই। আপনাকে বেশ মানিয়েছে এই নীল পাগড়িতে।' এ কথা বলে লোকটি চলে যায়।

এদিকে ব্যবসায়ীটি বারবার তার পাগড়িটি নেড়েচেড়ে দেখে আর বলতে থাকে, 'এরা সবাই কি পাগল? পাগড়িটি তো সাদাই দেখছি।'

এরই মধ্যে চতুর্থজন এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। সে গলায় রস ঢেলে জিজ্ঞেস করে, 'মাশাআল্লাহ! এত সুন্দর লাল পাগড়িটা আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?' ব্যবসায়ীটি চিৎকার করে বলে, 'না, আমার পাগড়ি নীল।' আগন্তুক বলে, 'না, আমি তো লালই দেখছি। ব্যবসায়ীটি এবার পাগলের মতো করতে থাকে, 'না, আমার পাগড়ি সবুজ। না-না, সাদা। না-না, নীল। না-না, কালো...।'

এরপর থেকে সে এই হাসে, এই কাঁদে; একটু চুপ করে থেকে পরক্ষণেই খেঁকিয়ে ওঠে, অকারণে ছোটাছুটি করে পথেঘাটে।'

ইবনু হাযম এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ঘটনার পর আমি ওই ব্যবসায়ীকে পাগল হয়ে স্পেনের পথে পথে ঘুরতে দেখেছি। বাচ্চারা তাকে দেখলে ঢিল ছুড়ে মারত।'

চারজন ধূর্ত লোক যদি তাদের চাতুর্য কাজে লাগিয়ে একজন মানুষের স্বভাব বদলে দিতে পারে; বরং বিগড়ে দিতে পারে তার মস্তিষ্ক—তবে আপনি কেন পারবেন না

কুরআন-হাদিস থেকে আহরিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেকে সাফল্যমণ্ডিত করতে—বিশেষত আল্লাহ যখন এ দক্ষতা অর্জন ও তার চর্চাকে আপনার জন্য ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন?

তাই জীবনে সুখী ও সফল হতে আপনার অর্জিত দক্ষতাগুলো কাজে লাগান। নিজেকে বদলানো সম্ভব নয়—দয়া করে এই খোঁড়া যুক্তি দেওয়া বাদ দিন। তারপরও যদি মনে হয় আপনি পারবেন না, তবে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলব—একবার অন্তত চেষ্টা তো করে দেখুন! আর যদি বলেন, আপনার উপায় জানা নেই, তবে বলব, শিখুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করতে হয় লেখাপড়ার মাধ্যমে। আর ধৈর্য শিখতে হয় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে।'[১]

দৃষ্টিভঙ্গি

মহান তো সে, যে শুধু নিজের দক্ষতারই মানোন্নয়ন করে না; বরং তার চারপাশের মানুষদের দক্ষতা বাড়াতেও কাজ করে। অনেক সময় বদলে দেয় তাদের সহজাত স্বভাব ও চিন্তার গতিপথও।

[১] *আল-মুজামুল কাবির* : ২৬৬৩; *সহিহুল জামি* : ২৩২৬; *মুসনাদুশ শামিয়িন* : ২১০৩; *শুআবুল ঈমান* : ১০২৫৪; হাদিসটির সনদ হাসান।

হতে হবে সবার সেরা

অনেক সময় দেখা যায়, দুজন মানুষ একটি বিষয়ে বিতর্ক করছে। হয়তো উভয়েই সুন্দর একটি সমাধান চাইছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের সে বিতর্ক পর্যবসিত হচ্ছে অমীমাংসিত বিবাদে। আবার এমন বিতার্কিকও দেখা যায়, যারা বিতর্ক করে ঠিক, তবে তাদের সে বিতর্ক শেষ হয় সমঝোতা ও সমন্বিত একটি সমাধান আহরণের মধ্য দিয়ে। বিতর্ক বা কথা বলার দক্ষতা মূলত এখানেই।

আপনি এমনও দেখে থাকবেন, দুজন বক্তা একই বিষয়ে বক্তৃতা করছে। তাদের ব্যবহৃত শব্দ-বাক্য হুবহু এক অথবা কাছাকাছি। তবু তাদের একজনের বক্তৃতার সময় শ্রোতারা ঘনঘন হাই তোলে। অনেকে ঝিমায়। পরনের কাপড় অথবা জায়নামাজ নেড়েচেড়ে সময় পার করে কেউ কেউ। ক্লান্তিতে বারবার বসার ধরন বদলাতে থাকে। কিন্তু অপরজনের বক্তৃতা শোনে বিমুগ্ধ হয়ে। মুহূর্তের জন্যও কেউ অন্যমনস্ক হয় না। ঘুমের চাপও দেখা যায় না কারও মধ্যে।

কেন এমন হয়? কেন একজনের বিতর্ক বিবাদের জন্ম দেয়—যেখানে অন্যজন বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঠিকই সমাধানের পথ খুঁজে পায়? কেন একজনের বক্তৃতার সময় শ্রোতারা আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়, মোবাইলে মেসেজ পড়ে সময় পার করে—যেখানে অন্যজন কথা বললে সবাই মন দিয়ে শোনে; বিমোহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে আলোচকের প্রতি?

কেন এমন হয়?

কথা বলার দক্ষতার কারণে।

আপনার যদি দক্ষতা থাকে এবং সেটা কাজে লাগাতে পারেন, তবে সফলতা পদচুম্বন করবেই। কিন্তু কারও অবস্থা যদি হয় এর ব্যতিক্রম, তবে ব্যর্থতাই সেখানে শেষ কথা।

আপনার এমন অভিজ্ঞতাও হয়তো থেকে থাকবে, একজন শিক্ষক স্কুলের করিডোর দিয়ে অফিসকক্ষে অথবা ক্লাসরুমে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা তাকে ঘিরে ধরছে। কেউ তার সাথে মুসাফা করছে। কেউ পরামর্শ চাইছে। কেউ-বা আবার সমস্যার কথা তুলে ধরে জানতে চাইছে সমাধান। তিনি যেদিক দিয়েই যাচ্ছেন, হইচই পড়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অফিসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে মুহূর্তেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অফিসকক্ষ। সবাই তার সঙ্গ পেতে আকুল, তার দুটো কথা শুনতে ব্যাকুল।

ঠিক একই সময়ে একই স্কুলের আরেকজন শিক্ষক সম্পূর্ণ একা। কোনো শিক্ষার্থী তার কাছে ভিড়ে না। চাইতে আসে না কোনো পরামর্শ। মুসাফার জন্য হাত বাড়ায় না। অভিযোগও জানায় না কোনো ব্যাপারে। তাকে সবসময় নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। তিনি যদি সারা দিন অফিস খুলে বসে থাকেন এবং দরজায় বড় করে লিখে রাখেন—সবার জন্য প্রবেশাধিকার অবারিত—তবু কেউ তার কাছে যাওয়ার গরজ করে না।

কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে।

একজন মানুষ কোনো বৈঠকে উপস্থিত হলে সবাই তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তার সাক্ষাতে আনন্দিত হয়। মনে মনে কামনা করে—ইশ, ভদ্রলোক যদি আমার পাশে এসে বসতেন! কিন্তু ঠিক একই সময়ে একই পদের আরেকজন সেখানে উপস্থিত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। লোকজন নিয়ম রক্ষার্থে শীতল অভ্যর্থনা দেয়। এরপর তাকে বসতে দেওয়ার জন্য একটি খালি আসন খোঁজে। কিন্তু কেউ তার জন্য নিজের আসনটি ছাড়তে চায় না। এমনকি পাশের খালি আসনটিতে সে বসুক—এটাও কেউ চায় না।

কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে, যা দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া যায় এবং প্রভাব বিস্তার করা যায় তাদের ওপর।

একজন বাবা বাইরে থেকে ঘরে এলে ছেলেমেয়েরা তাকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। কাছেপিঠে থাকে সবসময়। অপরদিকে আরেকজন বাবা বাসায় ফিরলে ছেলেমেয়েরা তটস্থ হয়ে থাকে। ফিরেও তাকায় না তার দিকে। কাছে আসার কথা ভাবতেও পারে না তারা।

উভয়েই তো বাবা। তারপরও কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে।

এমন দৃষ্টান্ত পরিবার-সমাজ, অফিস-আদালত সবখানেই সমান হারে পাবেন। মনে রাখবেন, মানুষের সাথে আপনার আচরণ যে মানের হবে, আপনিও তাদের থেকে ঠিক সেই মানের আচরণটিই পাবেন। এ সূত্র মানলে, মানুষের মধ্যে আপনার একটি প্রভাব-বলয় তৈরি করা এবং নিজেকে তাদের ভালোবাসার জায়গায় নিয়ে যাওয়া কল্পনার চেয়েও বেশি সহজ।

কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ব্যাপারটা এমনই। আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সহজ কিছু দক্ষতা ও কৌশল রপ্ত করেই আমরা মানুষের হৃদয় জয় করতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে, এ আচরণ-কৌশল মেকি হতে পারবে না। অনবরত চর্চার মাধ্যমে এগুলোকে উন্নীত করতে হবে স্বভাবের পর্যায়ে।

আমরা অনুভব করি বা না-করি, মানুষজন আমাদের আচরণে প্রভাবিত হয়। আমাদের সুন্দর আচরণগুলো তাদের মধ্যে সঞ্চার করে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আমার নিজেরই একটি ঘটনা বলি। আমি ৩ বছর ধরে একটি কলেজ মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছি। মসজিদে যেতে একটি গেট পার হতে হয়। যতবারই গাড়িতে করে গেট পার হই, গেটম্যানের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় সালাম দিই, একটু মুচকি হাসি; লৌকিক হাসি নয়—আন্তরিক বিমল হাসি। সালাত শেষে বাসায় ফিরে আসি। সালাতের সময়টায় অনেকগুলো ফোনকল আর মেসেজ এসে জমা হয়ে থাকে। ফেরার পথে সেগুলোর প্রতিউত্তর দেওয়ায় ব্যস্ত থাকি। সেজন্য ফেরার সময় সালাম ও হাসি বিনিময় সম্ভব হয় না।

একদিন মসজিদের গেট পার হওয়ার সময় গেটম্যান আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। একটু অবাকই হই আমি। গাড়ির জানালা নামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে সে বলে, 'শাইখ, আপনি কি কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছেন?'

'না তো, কেন?'

'আপনি গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময় হাসিমুখে সালাম দেন, কিন্তু বের হওয়ার সময় যে আমার দিকে ফিরেও তাকান না!'

লোকটি ছিল খুবই সহজ-সরল। আমার মনোযোগ পেতে সে বলে, 'আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনার সাক্ষাৎ আমার জন্য পরম আনন্দের।'

আমি তখন দুঃখ প্রকাশ করি। ব্যস্ততার ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলি। এতে সে আশ্বস্ত হয়।

এ ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। বুঝতে পারি, চেতনে হোক বা

অবচেতনে, আচরণ-দক্ষতা নিয়মিত কাজে লাগালে সেগুলো আমাদের স্বভাবের অংশ হয়ে ওঠে। এরপর কখনো কারও বেলায় সেসব আচরণ প্রকাশ না পেলে, মানুষই স্বপ্রণোদিত হয়ে সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্মরণিকা

সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে মানুষের কথা ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারাও সম্পদ উপার্জনের একটি মাধ্যম।

কে আপনার বেশি প্রিয়?

আচরণ-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে যদি নিজেকে সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে প্রত্যেকের সাথে এমন নিপুণ আচরণ করতে হবে, যেন সে মনে করতে বাধ্য হয়—সে-ই আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই আপনার মায়ের সঙ্গে এমন আচরণ করুন, যেন তিনি অনুভব করেন—এরকম মমতাপূর্ণ আচরণ আপনি শুধু তার সাথেই করে থাকেন। তিনি ছাড়া আর কারও বেলায় এমন আচরণের কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

আপনার বাবা, স্ত্রী-সন্তান ও সহকর্মীদের সঙ্গেও একই আচরণ করুন। শুধু তা-ই নয়, জীবনে যাদের সঙ্গে এক-দুবারের বেশি দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাদের সামনেও নিজেকে একইভাবে উপস্থাপন করুন। ফুটপাতের দোকানি অথবা ফিলিং স্টেশনের সাধারণ কর্মচারীকেও প্রভাবিত করুন অমায়িক ব্যবহারে। এভাবে সবখানে গড়ে তুলুন মমতাপূর্ণ পরিবেশ।

মনে রাখবেন, মানুষ আপনাকে তখনই সবচেয়ে প্রিয়ভাজন বলে স্বীকৃতি দেবে, যখন আপনার পরিশীলিত আচরণ তাদের মধ্যে এ অনুভব সঞ্চার করবে—তাদের প্রত্যেকে আপনার কাছে অপরের চেয়ে বেশি প্রিয়।

এক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে পারেন আমাদের উত্তম আদর্শ। উন্নত আচার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ; সর্বকালের সেরা দৃষ্টান্ত। তিনি সবাইকে সম্মান দেখাতেন, গুরুত্ব দিতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন সবার সাথে। কেউ কোনো প্রয়োজন বা সমস্যা নিয়ে এলে, পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আগে তার কথা শুনতেন। তারপর সমাধান দিতেন। কাউকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলতেন না। খালি

হাতেও ফেরাতেন না কাউকে। তার এ নিপুণ আচরণের প্রভাবে প্রত্যেকেই ভাবতে বাধ্য হতো—সে-ই বুঝি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। ফলে তিনিও হয়ে উঠতেন সবার প্রিয়ভাজন। কারণ তিনি সবার মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই তার কাছে অন্যের চেয়ে বেশি প্রিয়।

এবার একটি ঘটনা বলি। আমর ইবনুল আস ছিলেন আরবের সেরাদের একজন। জ্ঞানেগুণে বেশ নামডাক ছিল তার। ইসলামগ্রহণের পর নবিজির সাথে তার প্রায়ই দেখা হতো। প্রতিবার তিনি লক্ষ করতেন, তাকে দেখলেই নবিজির চেহারা খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার কোমল ঠোঁটে—যে হাসি বরাদ্দ থাকে কেবল প্রিয়জনদের জন্য। অনুরূপ তিনি যখন নবিজির মজলিসে উপস্থিত হতেন, তার মনে হতো—নবিজি যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় ছিলেন। তাই তার আগমনে বেশ পুলকিত তিনি। এছাড়া তিনি যখন তাকে ডাকতেন, তার সবচেয়ে প্রিয় আর সুন্দর নামটি ধরে ডাকতেন।

নবিজির এ সযত্ন দৃষ্টি, আন্তরিক আচরণ ও অভূতপূর্ব গুরুত্ব পেয়ে তার মনে হয়, নবিজি বুঝি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই তিনি ভাবেন, বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেজন্য একদিন নবিজির কাছে যান। একেবারে তার পাশটিতে গিয়ে বসেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন—

‘আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে?’

‘আয়িশা।’

‘আয়িশা তো আপনার স্ত্রী। এ ব্যাপারে জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছি পুরুষদের মধ্যে কে আপনার বেশি প্রিয়?’

‘তার বাবা আবু বকর।’

‘তার পরে?’

‘উমার ইবনুল খাত্তাব।’

‘তার পরে?’

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইসলামগ্রহণে অগ্রগামিতা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার দিকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, ‘তার পরে অমুক, তার পরে তমুক, তার পরে...।’

আমর বলেন, ‘নবিজির লম্বা ফিরিস্তি দেখে আমি চুপ হয়ে যাই—হয়তো আমার ঠাঁই

হবে তালিকার একেবারে শেষে, সেই ভয়ে।[১]'

দেখুন, নবিজি তার আচরণ-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। শুধু আমর কেন, নবিজি সবাইকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। সবার ব্যক্তিগত মর্যাদা ও বোধবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রেখে কথা বলতেন। অনেক সময় তাদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কর্তব্য কাজে পর্যন্ত বিরতি নিতেন। নিজেকে অবসর রাখতেন আগন্তুক আর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য।

ইসলামের বিজয়যাত্রা শুরু হলে নবিজি বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে সেখানে দূত প্রেরণ করেন। প্রয়োজন মনে করে অনেক জায়গায় পরিচালনা করেন সেনা অভিযান। সেসময় তাঈ গোত্রের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বাধে। এ গোত্রের প্রধান ছিলেন আদি ইবনু হাতিম। আদি যুদ্ধ না করে পালিয়ে যান। আশ্রয় নেন শাম দেশে।

এদিকে মুসলিম বাহিনী তাঈ এলাকায় পৌঁছে যায়। নেতৃত্বের অভাবে সেখানকার লোকেরা ছিল অবিন্যস্ত। ফলে সহজেই জয় পেয়ে যায় মুসলিম বাহিনী। বরাবরের মতো এ যুদ্ধেও তারা বেসামরিক লোকজন ও পরাজিত সৈনিকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। বন্দিদের নিয়ে চলে আসে নবিজির কাছে। নবিজি আদির পলায়নের খবর জানতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ করেন—একজন গোত্রপ্রধান তার ধর্ম ও অধীনস্থদের ছেড়ে কীভাবে পালিয়ে যেতে পারে!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদিকে ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু তখন সহজ কোনো উপায় ছিল না তার হাতে। ওদিকে দূরদেশে আদির মন টেকে না। মদিনায় ফিরে আসার প্রচণ্ড তাড়া অনুভব করেন। একসময় ফিরেও আসেন। তখন পরাজিত শত্রু হিসেবে বাধ্য হয়েই তাকে নবিজির সঙ্গে সন্ধি ও সমঝোতায় যেতে হয়।

চলুন, আদির মদিনায় ফেরার গল্পটা তার মুখ থেকেই শুনি। আদি বলেন—

বোধ করি, গোটা আরবে আমিই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম আল্লাহর রাসুলকে। আমি ছিলাম খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী; মহামান্য ধর্মযাজক। তাছাড়া গোত্রের নেতৃত্বও ছিল আমার হাতে। ফলে নবুয়তের কথা শুনে আল্লাহর রাসুলের প্রতি একটু বেশিই বিতৃষ্ণা জন্মে আমার মধ্যে। এজন্য আমি রোমসম্রাট কাইসারের কাছে চলে যাই। কিন্তু সেখানে আমার মন টেকে না। কেবল মনে হয়, একবার অন্তত নবুয়তের দাবিদার লোকটার সঙ্গে দেখা তো করতে পারি! সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এটা নিশ্চিত। আর যদি সত্যবাদী হয়, তবে আমি এতটাও নির্বোধ নই যে, সত্য-মিথ্যার

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৩৫৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৮৪; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৮৮৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮০৬৩; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৬

পার্থক্য করতে পারব না।

এ ভেবে আমি মদিনায় ফিরে আসি। লোকেরা আমাকে দেখে বলতে থাকে, 'ওই দেখো, আদি ইবনু হাতিম চলে এসেছে।'

মদিনায় পৌঁছে আমি সোজা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে দেখা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আদি ইবনু হাতিম না?'

আমি বলি, 'জি।'

আদি ছিলেন যুদ্ধ-পলাতক আসামি। প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী। খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। তারপরও আল্লাহর রাসুল তার আগমনে খুশি হন। উষ্ণ অভ্যর্থনায় তাকে বরণ করে নেন। এরপর পরম যত্নে তার একটি হাত মুঠে পুরে ঘরের উদ্দেশে রওনা করেন। নবিজির সাথে হাঁটতে হাঁটতে আদি ভাবেন—

'আমি আর মুহাম্মাদ তো একই মানের নেতা। আমি তাঈ ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার আর মুহাম্মাদ মদিনা ও তার আশপাশের এলাকার। মুহাম্মাদ আসমানি ধর্মের অনুসারী, আমিও তো ঠিক তা-ই। মুহাম্মাদের কাছে কুরআন আছে আর আমার কাছে আছে ইনজিল। তাছাড়া সামরিক শক্তিতেও তার আর আমার মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই।'

কিন্তু পথিমধ্যে তিনটি ঘটনা ঘটে, যা আদির ভাবনা আমূল বদলে দেয়। প্রথমবার এক মহিলা নবিজির পথ আগলে দাঁড়ায়। তাকে ডেকে বলে, 'আল্লাহর রাসুল, একটু দাঁড়ান, আপনার কাছে আমার বিশেষ একটি দরকার আছে।' নবিজি আদির হাত ছেড়ে মহিলাটির কাছে যান। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনেন এবং সমাধান বলে দেন।

আদি এর আগে অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে গিয়েছে। প্রজা-সাধারণের সাথে তাদের আচরণ কেমন হয়, সে অভিজ্ঞতা তার আছে। এর সাথে তিনি মহিলাটির সঙ্গে নবিজির আচরণ তুলনা করেন। তখন অস্ফুট আওয়াজে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—'এটা রাজা-বাদশাহদের আচরণ নয়; নবিরাই কেবল মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারে।'

মহিলাটি চলে গেলে নবিজি আদির কাছে ফিরে আসেন। আবার তারা আগের মতো একসাথে পথ চলতে থাকেন। এবার এক লোক আসে নবিজির কাছে। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। কণ্ঠে হতাশা—'আল্লাহর রাসুল, অভাব যেন পিছু ছুটতে চাইছে না। পরিবারের দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার সাধ্যও এখন নেই। আশেপাশে যারা সচ্ছল মুসলিম আছে, তারা নিজেরা কোনো রকমে দিন গুজরান করতে পারলেও অন্যদের সাহায্য করার সামর্থ্য তাদের নেই।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দেন। লোকটি আশ্বস্ত মনে ফিরে যায়। আদি অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শোনেন।

এরপর আবার তারা পথ চলতে শুরু করেন। কিছুদূর এগোতেই আরেক লোক আসে ডাকাতের অভিযোগ নিয়ে। তার কণ্ঠে চরম উৎকণ্ঠা—'আল্লাহর রাসুল, আমাদের চারপাশে শুধু শত্রু আর শত্রু। জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই। কাফিরদের আক্রমণ আর ডাকাতদের উৎপাতের কারণে মদিনার বাইরে পর্যন্ত যেতে পারি না।'

নবিজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হবে। নারীরাও একাকী নিরাপদে সফর করতে পারবে দেশ থেকে দেশান্তরে।'

আদি এবারও তাদের কথোপকথন শোনেন। তার মধ্যে ভাবান্তর ঘটে—'মুহাম্মাদ স্বজাতির কাছে অত্যন্ত সম্মানিত, সকলের শ্রদ্ধাভাজন। স্বজাতির মধ্যে কোনো শত্রু নেই তার। রাজা-বাদশাহরা এত অনন্যসাধারণ হয় না। মুহাম্মাদের মধ্যে কিছু একটা তো অবশ্যই আছে।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজায় কড়া নাড়লে আদির ভাবনায় ছেদ পড়ে। উভয়ে ঘরে গিয়ে বসেন। ঘরে বসবার মতো একটিমাত্র আসন ছিল। নবিজি সেটি আদির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'দয়া করে এটাতে বসুন। মেহমানের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য।'

আদি সেটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনিই এটাতে বসুন। আমি মাটিতে বসছি।'

নবিজি বলেন, 'না, এটা হয় না। আপনি মেহমান। আপনাকেই বসতে হবে।'

এবার আর না করতে পারেন না আদি।

নবিজি এবার আদির ইসলামগ্রহণের বাধাগুলো দূর করতে চান—

'আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন; নিরাপদ থাকবেন।' নবিজি কথাটি তিনবার বলেন।

'আমি যে আগে থেকেই একটি ধর্মের ওপর আছি!'

'আমি আপনার দ্বীন সম্পর্কে আপনার চেয়েও ভালো জানি।'

'এটা কী করে সম্ভব? এমন হতেই পারে না।'

'এমনই। আচ্ছা, আপনি কি রাকুসি সম্প্রদায়ের লোক নন?'

পাঠক, লক্ষ করুন—মানুষকে প্রভাবিত করার কী অসামান্য দক্ষতা নবিজির। নবিজি চাইলে এখানে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, 'আপনি কি খ্রিষ্টান নন?' কিন্তু তিনি সেটা

করেননি। কারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক দল ও উপদল আছে। শুধু খ্রিষ্টান বললে তাতে বিশেষ কোনো আবেদন থাকত না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি রাকুসি নন?'

রাকুসি হচ্ছে খ্রিষ্টানদের বিশেষ একটি উপদল। এদের মধ্যে অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল কিছুটা। নবিজি এ সূক্ষ্ম তথ্য পরিবেশন করে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন আদিকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতে সফলও হয়েছিলেন তিনি।

এ প্রশ্ন কেন এতটা তাৎপর্যপূর্ণ—সেটা বুঝতে হলে নিচের কল্পচিত্রটি আপনার সামনে রাখতে হবে। ধরুন, আপনি ইউরোপের কোনো দেশে বেড়াতে গেছেন। সেখানে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি খ্রিষ্টান হচ্ছেন না কেন?'

উত্তরে বললেন, 'আমি তো যথারীতি একটি দ্বীন পালন করছি।'

এর প্রেক্ষিতে আপনি মুসলিম কিনা সেটা জানতে না চেয়ে সে আরও গভীরে গিয়ে সুনির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি শাফিয়ি, হাম্বলি, হানাফি বা মালিকি নন?'

এবার বলুন, তার এ প্রশ্নে আপনার কী মনে হবে?

আপনার মনে হবে, প্রশ্নকর্তা আপনার ধর্মের সবকিছু জানে।

আদির ক্ষেত্রে নবিজি ঠিক এ কাজটিই করেছেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের ভেতরে গিয়ে আদিকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করেছেন, 'আপনি কি রাকুসি নন?'

'হ্যাঁ, আমি রাকুসি।'

'আপনি যখন স্বজাতির সাথে যুদ্ধে অংশ নেন, তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ নিজের বরাদ্দে রাখেন না?'

'হ্যাঁ, রাখি।'

'আপনার ধর্মে তো এটা হারাম; তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, হারাম।' উত্তরটি দিতে গিয়ে আদির কণ্ঠ জড়িয়ে আসে।

'আমি জানি, আপনি ঠিক কী কারণে ইসলাম গ্রহণ করছেন না। আপনি ভাবছেন, সমাজের কাছে প্রত্যাখ্যাত সহায়-সম্বলহীন কিছু মানুষ যার অনুসারী, তিনি কী করে নবি হবেন? আচ্ছা আদি, আপনি কি হিরা নামক জায়গাটি দেখেছেন?'

'দেখিনি, তবে জায়গাটি সম্পর্কে আমার জানাশোনা আছে।'

'আপনি দীর্ঘায়ু পেলে দেখবেন, নারীরা একাকী উটের পিঠে চড়ে হিরা থেকে রওনা হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে যাবে। পথিমধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। অর্থাৎ শীঘ্রই ইসলাম শক্তি ও নিরাপত্তায় এমন পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন হজে গমনেচ্ছুক নারীরা হিরা থেকে মক্কায় এসে নিরাপদে হজ করে যাবে। তার সাথে মাহরাম ছাড়া আর কোনো নিরাপত্তারক্ষী থাকবে না। সে নির্ভয়ে শত শত জনপদ মাড়িয়ে আসবে। কিন্তু কেউ তার কেশাগ্রটিও স্পর্শ করার সাহস করবে না। তার জানমালের ক্ষতি করা তো দূরের কথা।'

এ কথা শুনে আদি ভবিতব্য সেসময়ের দৃশ্যকল্প চিন্তা করতে থাকেন—ইরাক থেকে একজন নারী হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। বহু পথ আর লোকালয় পেরিয়ে মক্কায় এসে নিরাপদে যাত্রাবিরতি করছে। তার মানে এ নিরাপত্তা আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ তাঈ পর্বতশ্রেণি ও তার গোত্রেও পৌঁছে যাবে।

আদি একটু অবাকই হন। মনে মনে ভাবেন, 'তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলোর তখন কী হবে, যাদের লুণ্ঠন ও অরাজকতায় দেশটা সবসময় অশান্ত থাকে!'

নবিজির ডাক শুনে তার ভাবনায় ছেদ পড়ে—

'আদি, আপনি দীর্ঘজীবী হলে আরও দেখবেন, কিসরার ধনভান্ডার মুসলিমদের দখলে চলে এসেছে।'

'কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার?'

'হ্যাঁ, কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার জয় করে সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেওয়া হাবে। আপনার আয়ু যদি দীর্ঘ হয়, তবে দেখবেন, লোকেরা যাকাতের সোনারুপা হাতে নিয়ে দরিদ্রদের খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু সেগুলো নেওয়ার উপযুক্ত কাউকে পাবে না। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে তখন দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকবে না।'

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'কিয়ামতের দিন তোমরা এক-একজন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় দেখা করবে, সেখানে কোনো দোভাষী থাকবে না। মানুষ ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। বাম দিকে তাকাবে, সেদিকেও একই অবস্থা লক্ষ করবে।'

আদি গভীর চিন্তায় ডুবে যান। নবিজি তাকে চিন্তার সাগর থেকে টেনে তুলতে সহসা জিজ্ঞেস করেন, 'আদি, আপনি এখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিচ্ছেন না কেন? আপনার দৃষ্টিতে কি আল্লাহর চেয়েও বড় কোনো ইলাহ আছে?'

আদি বলে ওঠেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া

কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

নবিজির চেহারা তখন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

আদি বলেন, 'পরবর্তীকালে আমি নিজ চোখে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হিরা হতে একাকী রওনা হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করেছে। পথিমধ্যে তার আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় ছিল না। আর রোমসম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমিও একজন। তোমরা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে দেখবে, যাকাত দেওয়ার জন্য মানুষ মুঠি মুঠি সোনারুপা নিয়ে বের হবে, কিন্তু কেউ সেগুলো নিতে চাইবে না।'[১]

আদির সাথে নবিজির আচরণগুলো নিয়ে একটু ভাবুন। একজন শত্রুভাবাপন্ন লোকের সাথে তিনি এমন অকৃত্রিম সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করেছেন যে, আদির হৃদয়ে সেটা গভীর রেখাপাত করেছে। তার পদগৌরব ও জাত্যভিমান ভুলিয়ে দিয়েছে এবং এটাই হয়েছে তার ইসলামগ্রহণের প্রধান কারণ।

আমরা যদি মানুষের সাথে এমন ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে পারি, তবে তারা এক মুহূর্ত না ভেবে আমাদের হাতে তুলে দেবে তাদের হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ।

অনুচিন্তা

অকপট বিনয় আর আচরণ-দক্ষতা কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই আমরা সমাজে একটি প্রভাব-বলয় তৈরি করে নিতে পারি। সেইসাথে শাসন করতে পারি মানুষের হৃদয়-রাজ্য।

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৯৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৮৫৮২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৬৬০৬; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৫৭

দক্ষতা কাজে লাগান

দক্ষতা একটি অপরিহার্য গুণ এবং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ। আপনি যদি এর সঠিক চর্চা এবং যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন, তবে আপনার জীবন হয়ে উঠবে সুখময় ও সৌভাগ্যমণ্ডিত। পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তি পেরিয়ে এর সুখ-সুরভি পৌঁছে যাবে পরকালেও। তাই দক্ষতা কাজে লাগান। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আপন-পর সবার কাছে এর বিনিয়োগ করুন। উপভোগ করুন সুখময় জীবন।

মনে রাখবেন, আপনাকে দক্ষ হতেই হবে। সেই দক্ষতা কাজেও লাগাতে হবে যথাসময়ে। কখনো মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে, কখনো-বা তাদের ভালোবাসা পেতে, কখনো আবার তাদের সংশোধন করতে।

মানুষকে সংশোধন করতে হলেও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে শুনুন একটি ঘটনা। আলি ইবনুল জাহম ছিলেন বিখ্যাত এক আরব কবি। ভাষায় বাগ্মিতা থাকলেও জাতিগতভাবে তিনি ছিলেন বেদুইন। সে কারণে যথেষ্ট রূঢ়তা ছিল তার স্বভাবে। তাছাড়া মরুভূমির বাইরের জীবন সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না।

তখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তার দরবারে বহিরাগতদের আনাগোনা ছিল নিয়মিত ঘটনা। আলি ইবনুল জাহম কোনো কারণে একবার বাগদাদে আসেন। লোকেরা তাকে জানায়, 'এখানে খলিফার প্রশস্তি গেয়ে বকশিশ পাওয়া যায়। তুমি যেহেতু কবি, তাই এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না।'

এ কথা শুনে আলির চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে। তখনই তিনি পা বাড়ান খলিফার প্রাসাদের দিকে।

সেখানে গিয়ে দেখেন, খলিফা মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে উপবিষ্ট। প্রচণ্ড প্রতাপ আর ভাবগাম্ভীর্য ঝরে পড়ছে তার শ্মশ্রু বেয়ে। সেগুলো কুড়িয়ে সভাকবিরা ছন্দ বাঁধছেন। অনিমেষ এক পরিতৃপ্তির আলো ছড়িয়ে পড়ছে খলিফার চেহারায়। তাদের দেখে আলিও খলিফার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। কবিতায় তিনি গ্রাম্য উপমার আশ্রয় নেন।

ফলে তিনি খলিফাকে কুকুর, ষাঁড়, কূপ, বালতি, মাটি, পাথর এবং এ জাতীয় তুচ্ছ জিনিসের সঙ্গে তুলনা করতে থাকেন। খলিফা এতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। প্রহরীরা উদ্যত হয় তাকে পাকড়াও করতে। জল্লাদ তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে আসে। মেঝের গালিচা গুটিয়ে নেওয়া হয়। মুহূর্তেই মুখরিত দরবার-হল পরিণত হয় থমথমে মৃত্যুমঞ্চে।

খলিফা ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আলির বেশভূষা আর শব্দপ্রয়োগ থেকে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, স্বভাবের কাছে সে অসহায়। যে পরিবেশ থেকে সে উঠে এসেছে, সেখানে এসব শব্দেই মানুষের প্রশংসা করা হয়। মরুজীবনে এক বালতি পানি আর একটি কূপ পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান আর দরকারি বস্তু। তাই হাতের ইশারায় তিনি সবাইকে শান্ত করেন এবং আলির স্বভাব বদলে তাকে এক নাগরিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থির করেন।

খলিফার নির্দেশে এক সুরম্য প্রাসাদে আলির থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয় তিনবেলা। সময়ে-অসময়ে সুন্দরী দাসীরা এসে বিনোদন দিয়ে যায় তাকে। সে এখন পুরোদস্তুর রাজকীয় মেহমান। জীবনের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ হাতের নাগালে। বহু মানুষ তার আজ্ঞা মেনে চলে। রাজকবিরা তার নিয়মিত সঙ্গী। সংগীতসন্ধ্যায়ও আছে তার সরব উপস্থিতি। এভাবে বিপুল সমারোহে জীবনের মধুময় সাতটি মাস কেটে যায়।

এরই মধ্যে খলিফা একদিন সংগীতসন্ধ্যার আয়োজন করেন। সবাই উপস্থিত হলে তিনি আলিকে স্মরণ করেন। আলি 'বান্দা হাজির' বলে তার উপস্থিতি জানান দেয়। খলিফা তাকে বলেন, 'এবার আমাকে নিয়ে একটি কবিতা বলো।'

আলি এবার কমনীয় শব্দমালায় সভাসদদের অনুভূতি নাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি খলিফাকে তুলনা করতে থাকেন চন্দ্রসূর্য আর আকাশ-সাগরের সাথে।

দেখুন, খলিফা কীভাবে তার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আলি ইবনুল জাহমের স্বভাব ও চিন্তার গতিপ্রকৃতি বদলে দিলেন। আমরাও তো প্রায়ই সন্তানসন্ততি ও বন্ধুবান্ধবদের রূঢ় আচরণের অভিযোগ করি। কিন্তু কখনো কি তাদের স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছি? চাইলে কিন্তু আমরাও খলিফার মতো চেষ্টা করে দেখতে পারি। আশা করি, এতে লাভ

ছাড়া ক্ষতি হবে না।

তবে এ অভিযানে নামতে হলে সবার আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। তাই দক্ষতা কাজে লাগান। বিরক্তিকে পরিণত করুন হাসিতে। ক্রোধকে সংযমে নামিয়ে আনুন। ছেড়ে দিন কৃপণতা। কাজ করুন ধৈর্যের সাথে। একটুখানি সাহস, সদিচ্ছা আর প্রতিজ্ঞা থাকলে এগুলো কঠিন কিছু নয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার লক্ষ করলে দেখবেন, তিনি মানুষের সাথে অকপট বিনম্র আচরণ করতেন। সবাইকে ভালোবেসে কাছে টানতেন। মানুষভেদে বিলাতেন শ্রদ্ধা ও স্নেহ। এভাবেই সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিতেন তিনি। পেশাদার বা লৌকিক আচরণ বলতে যা বোঝায়, তার আচরণ মোটেও তেমন ছিল না। পেশাদার লোকেরা অনেক সময় নিছক পেশার খাতিরে মানুষের সঙ্গে ভব্য ও নমনীয় আচরণ করে। কিন্তু কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরলে তাদের অবস্থা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের সহিষ্ণুতা রূপ নেয় ক্রোধে, কোমলতা পর্যবসিত হয় রূঢ়তায়। পরিবারের লোকজন তাদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

আমাদের নবিজি এমন ছিলেন না। বাইরে হাসি বিলিয়ে ঘরে এসে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতেন না। দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে তার সদাচারের ভাগ দিয়ে স্ত্রী-সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না। তার সদাচরণ ছিল সহজাত; সবার জন্য অবারিত।

তার দৃষ্টিতে মানুষের প্রতি সদাচরণ ছিল চাশত ও তাহাজ্জুদ সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ; ব্যাবহারিক জীবনের সার্বক্ষণিক ইবাদত। এজন্য হাসিমুখে কথা বলাকে তিনি আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার মাধ্যম বলেছেন। বিনম্র আচরণকে ইবাদত বলে স্থির করেছেন এবং দয়া ও ক্ষমাগুণকে গণ্য করেছেন নেক আমল হিসেবে।

নবিজির অনুকরণে যে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলতে পারবে, সদাচার ও চারিত্রিক কোমলতায় সে ইবাদতের স্বাদ ও পরিতৃপ্তি পাবে। ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কেউ একবার এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, সীমাহীন রোগশোক ও দুঃখকষ্টেও সদাচার ও চারিত্রিক কোমলতা বিসর্জন দিতে পারে না—কেবল এর আস্বাদ ও পরিতৃপ্তির টানে। ফলে বঞ্চনা বলুন কিংবা প্রাপ্তি—সর্বাবস্থায় তার আচরণ থাকে কোমল ও মানবিক।

আমাদের সমাজে এমন অনেক নারী রয়েছেন, যারা বাইরে গেলে লোকমুখে তাদের স্বামীর প্রশংসা শোনেন। মানুষ আবেগে গদগদ হয়ে তাদের স্বামীর দয়া, সদাচার ও মহানুভবতার গল্প করে। কিন্তু ঘরে তারা সেসবের ছিটেফোঁটাও দেখেন না। বাইরের লোকদের কাছে উদার, মহানুভব ও সদালাপী মানুষটা ঘরে এসে হয়ে ওঠে বদমেজাজি, কৃপণ ও সংকীর্ণমনা। খোঁটা ছাড়া ঘরের লোকদের সাথে কথা বলতে পারে না। কেউ যৌক্তিক কিছু চাইলেই কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। পান থেকে চুন খসলে হয়ে যায় ক্রুদ্ধ।

আমাদের নবিজি এমন ছিলেন না। তিনি ঘরে-বাইরে আচরণ-বৈষম্য পছন্দ করতেন না। তাই তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।'[১]

আসওয়াদ ইবনু ইয়াযিদ বলেন, 'আমি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আল্লাহর রাসুল ঘরের ভেতরে কীভাবে সময় যাপন করতেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসুল ঘরের কাজে তার পরিবারকে সাহায্য করতেন। সালাতের সময় হলে ওজু করে মসজিদে গমন করতেন।'[২]

তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে—সদাচার ও মহানুভবতা চর্চার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে স্ত্রী-সন্তান। তারপর সেটা ক্রমে মা-বাবা ও পরিবারের অন্যদের ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে।

আমাদের সমাজে এর উলটো চিত্রই দেখা যায় বেশি। এখানে যারা খুব সজ্জন আর সচেতন বলে পরিচিত, তাদের বেশিরভাগ লোকই নিজেদের হাসিমুখ, সদাচার ও উদারতা বরাদ্দ রাখে বাইরের লোকদের জন্য। আর যারা ঘরের লোক, একান্ত আপনজন, সদাচার ও হাসিমুখের সবচেয়ে বেশি হকদার, তাদের প্রতি থাকে সীমাহীন অবজ্ঞা আর প্রচণ্ড বিরাগভাব।

নবিজির ভাষ্যমতে এরা প্রকৃত সজ্জন নয়। প্রকৃত সজ্জন তো সে, যে তার স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, কাজের লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণে অভ্যস্ত।

নবিজির মজলিসে একদিন আবু লায়লা উপস্থিত ছিলেন। এসময় নবি-দৌহিত্র হাসান বা হুসাইন সেখানে উপস্থিত হয়। নবিজি তাকে আদর করে কোলে বসান। অমনি সে নবিজির কোলে প্রস্রাব করে দেয়। আবু লায়লা বলেন, 'আমি দেখেছি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোল বেয়ে প্রস্রাব গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তড়িঘড়ি তাকে সরিয়ে নিতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় নাতিকে আমার কোলেই থাকতে দাও; জ্বালাতন কোরো না ওকে।'

বাচ্চার প্রস্রাব শেষ হলে আল্লাহর রাসুল পানি আনতে বলেন। তারপর নিজেই সে প্রস্রাব

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৮৯৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯৭৭; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১০৯৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৩২৫২; হাদিসটি সহিহ।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬০৩৯; *মুসনাদুল বাযযার* : ৩২৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪২২৬

পরিষ্কার করেন।’[১]

আমাদের নবিজি এমনই উন্নত আচরণে অভ্যস্ত করেছিলেন নিজেকে। তাই তিনি যদি ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের হৃদয়-রাজ্য শাসন করেন, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

পরামর্শ

অন্ধকারকে গালি দেওয়ার পরিবর্তে প্রদীপটি মেরামত করুন।

[১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১২৯০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯০৫৬; *আল-মুজামুল কাবির* : ৬৪২৪; হাদিসটি সহিহ।